International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XII, January 2017, Page No. 01-09
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

প্রাচীন ভারতে শিক্ষায় দলিত - এক অসমাপ্ত অধ্যয়ন

বিপ্লব কুমার দাস
সহশিক্ষক মান্দ্রা হাজের আলি স্মৃতি বিদ্যাপীঠ (উঃমা)

সংক্ষিপ্তসার

শিক্ষা একটি সভ্য জনপদের উন্নয়ন পরিমাপের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। সমাজের মেরুদন্ড শিক্ষা, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই সভ্যতার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রধানতম ভূমিকা পালন করে চলেছে। আক্ষরিক অর্থে 'শিক্ষা'-র উৎপত্তি সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে, যার অর্থ শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা বা নিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি। শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সমাজের অতীত ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সময়ের পরম্পরা অনুযায়ী সঞ্চালিত হয় পরবর্তী অপত্য জনধারায় তেমনি বহিঃবিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তি মননের তথা সৃষ্টিশীলতার আদান-প্রদানও সম্ভব হয় শিক্ষার মাধ্যমে। ফলে ব্যক্তিকল্যাণ এবং সামগ্রিক অর্থে সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সর্ব্বোত্তম উপায় হল শিক্ষা। আবার একথাও ঠিক যে, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক দর্শন দ্বারা। ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন সভ্যজনপদে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যুগেযুগে সমৃদ্ধ হয়েছে বহু মনিষীর উন্নত জীবনদর্শন ও শিক্ষাভাবনা দ্বারা। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজকের সমসাময়িক শিক্ষাভাবনাতেও ভারতীয় সমাজদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। মূলত সামাজিক চাহিদার নিরিখেই পরিচালিত হয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাপনা। ফলে শিক্ষাআঙিনায় বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, স্তরবিন্যাস, সামাজিক পরিবর্তন, গতিশীলতা, প্রথা-রীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি ভারতীয় সমাজ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বর্ণভেদ তথা জাতিভেদ ব্যবস্থা আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে আলোচিত ভয়ানক তথা চিরপ্রাচীন একটি ক্ষত, যা যুগেযুগে শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে নি, শিক্ষাব্যবস্থাও যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে এই অমানবিক অসাম্যের দ্বারা। যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ শিক্ষায় আজও আমরা সঠিকমানের সমানাধিকার বাস্তবিক অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। স্বাধীনোত্তর সময়ে আইন প্রনয়ণ, নীতি গ্রহণ, সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বা সংরক্ষণের মতো রাজনৈতিক মর্যাদাদান সবই হয়েছে নিম্নবর্ণীয় মানুষের সেবার্থে কিন্তু এই আশীর্বাদ সর্বজনীনতা বা সার্বিক সাফল্য লাভ করেনি সেভাবে। আজও সমাজের সেই ক্ষত নিরাময়ের আন্তরিক ও যথার্থ প্রচেষ্টার অভাবে শিক্ষাব্যবস্থাপনা বারবারে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে এই ঘৃণ্য সামাজিক কাঠামো বিন্যাসের দ্বারা। ফলে সঠিক মানের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হচ্ছে আজকের আধুনিক শিক্ষাচিন্তাও। যদিও এই ব্যর্থতার কারণসমূহ বয়ে এসেছে কালের বহমানতায়। প্রাচীন বর্ণভেদ প্রথা কালক্রমে সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ বা অন্যান্য সামাজিক কারণে আজকের জাতিভেদে রূপ বদলেছে । ফলে এই অসাম্যেরও গঠনগত পরিবর্তন এসেছে সময়ের সাপেক্ষে, যা প্রতিটি যুগের শিক্ষা উদ্দেশ্যকে ব্যহত করেছে বিভিন্নভাবে। সভ্যতার উষালগ্নে প্রাচীন যুগের বৈদিক শিক্ষায় সর্বপ্রথম এই অসমসুযোগের ধারা পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তীতে মহাকাব্যের যুগ ধরে মধ্যযুগে এমনকি আধুনিক যুগেও বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় প্রকাশিত। বর্ণভেদের মতো অসামাজিক প্রথার উপস্থিতির কারণেই প্রাচীনবৈদিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অসাম্যের রূপ আমরা দেখতে পাই, যা সমসাময়িক কালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যদিও এর ব্যাতিক্রমী দর্শনও ছিল। প্রাচীন কালের ভারতীয় শিক্ষায় একমাত্র বৌদ্ধভাবনাতেই সামাজিক সাম্যের ও শিক্ষায় সমানাধিকারের সুর ধ্বনিত হয়েছিল। আবার বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করেও মহাকাব্য যুগের শিক্ষা হয়ে উঠেছিল অনেকটাই বাস্তব ও বৃত্তিভিত্তিক। অর্থাৎ প্রাচীনকালের ভারতীয় শিক্ষায় শূদ্রের অবস্থান বিভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন আঙ্গিকে পরিলক্ষিত ও আলোচিত হয়েছে দৃঢ়তার সঙ্গেই। এই লেখায় প্রাচীনকালের ভারতীয় শিক্ষায় বর্ণভেদের উপস্থিতি বা শিক্ষায় শূদ্রের অবস্থান তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। বৈদিকযুগের বিভিন্ন সময়ের সামাজিক বিন্যাসকরণের আলোকে সেযুগের শিক্ষাব্যবস্থাপনার অসম দিকটি আলোচিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবেই। প্রকৃত অর্থে এটি একটি অসমাপ্ত অধ্যয়ন ......

সূচক শব্দ: দলিত, হরিজন, শূদ্র, অন্ত্যজবর্গ, বর্ণভেদ, শিক্ষায় অসমসুযোগ, বৈদিক শিক্ষা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, বৌদ্ধশিক্ষা, মধ্যযুগের শিক্ষা, মনুসংহিতা, রোহিত ভেমুলা

প্রারম্ভ : 'দলিত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ- [দ + ত + (স্ম) বিন্] অর্থাৎ যাকে দলন করা হয়েছে বা যে শোষিত, নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত, পিষ্ঠ এবং অস্পৃশ্য। প্রাচীন কালের 'শূদ্র' জনগোষ্ঠী ইংরেজ আমলের প্রথম পর্বে 'ডিপ্রাইভড ক্লাস', ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশনে 'Untouchable Castes', ১৯৩১-র আদমসুমারিতে বহির্ভূত জাত (Exterior Caste), ১৯৩৫- র ভারত শাসন আইনে তারা 'ডিপ্রেসড ক্লাস', মহাত্মা গান্ধী যাদের 'হরিজন' (জনগণের দেবতা) বলে অভিহিত করেছেন (নরসিনহা মেহতা নামে এক গুজরাটি ব্রাহ্মণ সাধু প্রথম 'হরিজন' শব্দটি ব্যবহার করলেও বহুল ব্যবহারের দ্বারা গান্ধীজী এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলেন)। তারাই আজকের ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে 'দলিত' বলে চিহ্নিত। যাদের মধ্যে তপসিলী জাতি – উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, ধর্মান্তরিত সংখ্যালঘু ও অন্ত্যজবর্গ অন্তর্ভুক্ত।[১]

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় দলিতরা তাদের যাবতীয় মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত। শূদ্র দলনকারী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাবে সমাজজীবনের প্রতিটি ছত্রেই দলিতেরা নিপীড়িত, শোষিত ও অস্পৃশ্য রয়েছে বহুকাল ধরেই। ডঃ ডি এন মজুমদারের কথায়- "The untouchable castes are those who suffer from various social and political disabilities many of which are traditionally prescribed and socially enforced by higher castes."।[২] সামাজিক জীবনে শূদ্রের প্রতি অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মতে ভারতের পতনের অন্যতম কারণ শূদ্রজাতিকে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য বলে বিবেচনা করা। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তিনি যে শূদ্র জাগরণের কথা বলেছেন, তা সাধারন মানুষের চেতনার উদ্বোধনকেই ইঙ্গিত করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা যুগে যুগে শূদ্র জনগণকে শাসন করেছেন, শোষন করেছেন, ঘৃণা ও অবহেলায় সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ এদেরই প্রাণান্তকর রুধিরস্রাবী পরিশ্রমে প্রস্তুত সম্পদের পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত ধনী জনগণরা।[৩] শিক্ষার ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। বেঁচে থাকার অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক অধিকারগুলির পাশাপাশি শূদ্রদের শিক্ষার অধিকারও 'অরণ্যে রোদন' রূপে পরিগণিত হয়েছে উচ্চবর্ণের সুযোগ- সুবিধাভোগী সমাজ ব্যবস্থার কাছে। যা প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালেও লক্ষ্যণীয়। ছান্দোগ্যোপনিষদ - এর ৪ প্রপাঠক (৪ অধ্যায়)–এ মহর্ষি গৌতম এবং সত্যকামের বাক্চরিতায় তা স্পষ্ট, শিক্ষায় সেই অসম সুযোগের রূপটি কবিগুরু তাঁর 'ব্রাহ্মণ'- রচনায় দেখিয়েছেন –

> "কুশল হউক সৌম্য, গোত্র কী তোমার ?
> বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
> ব্রহ্মবিদ্যালাভে"।[৪]

ভারতের জাতিভেদ বা বর্ণভেদের উৎস কেন্দ্র ঋগ্বেদের ১০ ম মন্ডলের 'পুরুষসূক্ত' - কে ধরা হলেও সেই সময়ের সামাজিক বিন্যাসকরণকে আজকের অর্থে জাতিভেদ প্রথা বলা যায় না । বৈদিক যুগের প্রথমে আর্যরা দ্বিজ ও অদ্বিজ – এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে বিশেষ করে ব্রাহ্মণসাহিত্য বা মনুসংহিতায় চতুর্বর্ণপ্রথা কঠোরতা লাভ করে। বৃত্তির কারণে সৃষ্ট হলেও এই জাতিভেদের নিষ্ঠুরতায় শূদ্রদের কোনরূপ শিক্ষাধিকার স্বীকৃত ছিল না সেযুগে। তারা ছিল বিস্তৃত শিক্ষা আঙিনায় অপাঙতেয়, বেদপাঠ ও শ্রবণের অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। সেই থেকে শুরু করে মহাকাব্যের যুগে, মধ্যযুগে এমনকি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাও দলিতের সংস্পর্শ পেতে ব্যাকুল হয়নি সেভাবে। যোগ্যতা- মেধা যুগে যুগে নিছক পর্যুদস্ত হয়েছে উগ্র- নিষ্ঠুর সামাজিক স্তর বিন্যাসের কাছে। আধুনিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে শিক্ষার প্রকৃত আলোক বা যথাযথ সমসুযোগের অভাবে আজও বঞ্চিত দলিতেরা। বিভিন্ন সময়ে সরকারী বা বেসরকারী তরফে শূদ্র জাগরণের উদ্যোগ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সেগুলি হয় প্রকৃত চাহিদা সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছে নতুবা সামগ্রিক প্রয়োজনের নিরিখে অনুসদৃশ। ফলে শিক্ষায় শূদ্রেরা সেই তিমিরেই।

আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব ১৫০০ অব্দে বৈদিক আর্যদের এদেশে আগমনের সময়কাল থেকে খ্রীঃপূর্ব ৬০০ অব্দে লিখিত সাহিত্যের আবির্ভাবের [৫] সময় পর্যন্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থা তথা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচলনার কেন্দ্রে ছিল বেদ। বেদের চারটি প্রকারের মধ্যে ঋগ্বেদ- ই ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ধারার নিদর্শন। এটি দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে ১৯১

টি বিভিন্ন ঋষিদৃষ্ট সূক্ত রয়েছে যার ৯০ তম পুরুষসূক্তটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬] ঋগ্বেদের বর্ণপ্রথার একমাত্র নিদর্শন রয়েছে এখানেই -

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।" [৭]

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিপুরুষ ব্রহ্মার মুখগহ্বর থেকে নিঃসৃত হয়েছে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং পদতল থেকে দাস বা শূদ্র সৃষ্ট। বর্তমানের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথার উৎসকেন্দ্র রূপে ঋগ্বেদের ১০-ম মন্ডলের পুরুষসূক্তকে ধরা হলেও সে যুগে বর্ণের সাথে কর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল, বর্ণভেদ আজকের ন্যায় জাতিভেদ রূপে ছিল না।

ঋগ্বেদে বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক সামাজিক শ্রেণী-বিভাজনের সূত্রপাত পরিলক্ষিত হলেও এই বিভাজনে কোনোরকম তীব্রতা বা অস্পৃশ্যতা জনিত সমস্যা ছিল না।[৮] সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে এই একটি মাত্র মন্ত্রেই চতুর্বর্ণ ও তাদের উৎপত্তি বিবৃত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীযুগের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে সমাজের জাতিভেদের উল্লেখ স্পষ্টতর -

তান্ড্যমহাব্রাহ্মণে (৫:৮:১১) পাওয়া যায়- "শূদ্র যজ্ঞের উপযুক্ত নয়, তার কোনো দেবতা নেই। কোনো দেবতা কখনো তাকে সৃষ্টি করেননি; সুতরাং শুধুমাত্র অন্য সকলের পদ প্রক্ষালন করেই তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়"। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪:১০১:৩১) বলা হয়েছে – "নারী, শূদ্র, কুকুর ও কালো পাখি হল অসত্য, পাপ ও অন্ধকার – তাই তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়"।[৯] আবার কৌষীতকি ব্রাহ্মণে শূদ্রকে বারাঙ্গনার থেকে হীন প্রতিপন্ন করা হয়েছে – এইভাবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বহু অংশে দেবতাদের সঙ্গে সমস্ত ধরণের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করে শূদ্রকে সমাজে অপাঙতেয় প্রতিপন্ন করার সচেতন প্রয়াস স্পষ্ট হয়েছে। শূদ্ররা উচ্চতর তিনটি বর্ণের বিত্ত, অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি মাঝে মাঝে ক্রীতদাস রূপে বর্ণীত হয়েছে। তৎকালীন সমাজের শূদ্রদের বিড়ম্বিত সমাজ জীবনের পরিচয় বহন করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি। ফলে সেইসময়কার সমাজ দর্শনের নিরিখে পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায়ও নির্মম ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাব ও পদদলিত শূদ্রদের বিড়ম্বনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একান্তই বেদকেন্দ্রিক। সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণের উচ্চ তিন শ্রেণীর উপনয়ন সংস্কারের পর বেদাধ্যায়নের বা দ্বিজত্বলাভের অধিকার জন্মাত। ব্রাহ্মণ সন্তানদের ৮ বছর বয়সে, ক্ষত্রিয়দের ১১ বছর এবং বৈশ্যদের ১২ বছর বয়সে উপনয়ন দান করা হত।[১০] যেখানে শূদ্রদের উপনয়ন, বেদ শ্রবণ ও পঠনের কোনোরূপ অধিকার ছিল না।শিক্ষা আঙিনায় শূদ্ররা ছিল অপাঙতেয় ও অস্পৃশ্য। যদিও বৈদিকযুগের একেবারে প্রথম পর্বে শূদ্রদের পাঠের অধিকার থাকলেও পরে গৌতম, বশিষ্ঠ, আপস্তম্বও শূদ্রদের বেদপাঠ থেকে বঞ্চিত করেছেন। অবশ্য আপস্তম্ব প্রথমে বিধান দিয়েছিলেন, নারী ও শূদ্ররা অথর্ববেদের একটি পরিশিষ্ট পাঠ করতে পারবেন এবং সেই অংশে আছে নৃত্যগীত, প্রাত্যহিক কলাবিদ্যা প্রভৃতি। তবে শূদ্রেরা যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারত না এবং 'নমঃ' শব্দটিও ব্যবহার করতে পারত না।[১১] দৈহিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ - কৃষি, পশুপালন, ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল তাদের জন্য। ফলত সৃষ্টির শুরুর দিকের এই সামাজিক অসাম্য ও অসম সুযোগের পরিনামে আজও শূদ্রদের শিক্ষা সামগ্রিক অর্থে তিমিরাচ্ছন্নই। সমাজের উচ্চ তিন বর্ণ যখন ব্যক্তিসত্তার চরম উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মোক্ষলাভের - আত্মোপলব্ধির সাধনায় মত্ত ছিল, শূদ্ররা তখন শিক্ষার পাদপ্রদীপের অন্ধকারে। মূলত এভাবেই ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে ভারতের বৃহত্তর জনসম্পদ। বহুযুগ ধরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিষ্ঠুরতার শিকার এই শূদ্রজাত।

তবে সাধারণ বেদ নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় শূদ্রের অধিকার না থাকলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে সাধারণত সব বর্ণেরই অধিকার ছিল। সুশ্রুত শল্যবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার স্বীকার করেছেন। তবে শূদ্রের ক্ষেত্রেও আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আয়ুর্বেদ উপনয়ন নিষিদ্ধ ছিল।[১২]

জাতিভেদ প্রথার সবচেয়ে প্রকট নিদর্শন রয়েছে 'মনুসংহিতায়'- যেটি প্রকৃতই শূদ্র দলন কাব্য। যেখানে ব্রাহ্মণেরা ভারতের সকল বর্ণের প্রভু, বিধাতা ও শাসনকর্তা হিসেবে নিজেদের প্রচার করলেন –

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্"।।[১৩]

অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান বা বেদার্থ- জ্ঞান ব্রাহ্মণের তপ, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের তপ, কৃষি বাণিজ্য বৈশ্যের তপ এবং সেবা করা শূদ্রের তপ। এইভাবে যোগ্যতা মেধা থাকা শূদ্রেরা কার্যত পরাজিত হয়েছে মনুসংহিতার প্রতিটি ছত্রের ব্রাহ্মণ্য বিধানের কাছে।

"অধীয়ীতি ন শূদ্রজনসন্নিধৌ"- শূদ্রের সামনে বেদপাঠ করতে নিষেধ করা হয়ছে মনুসংহিতায়।[১৪] ফলত শূদ্রদের জীবনের প্রকৃত অভিশাপ স্বরূপ এই মনুসংহিতা।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার গৌরবময় রবি যখন অস্তাচলে, তখন ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার কঠোরতা থেকে মুক্তির সন্ধানে ব্যকুল হয়ে ওঠে এই সভ্য জনসম্পদের বৃহত্তর অংশ। বেদবাহ্য সমাজে ব্রাহ্মণের এই জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সূচনা হয়েছিল বৌদ্ধ যুগের।

আনুমানিক খ্রীঃপূঃ ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সাথে সাথে পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগের বর্ণভেদের কঠোর - নির্মম দিকটি সমালোচিত হতে শুরু করে। বৌদ্ধ যুগের (খ্রীঃপূঃ ৬০০-৩০০ অব্দে) লেখকেরা সমাজে ক্ষত্রিয়ের স্থান সবার উপরে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিলেন- গৌতম বুদ্ধই। সমাজজীবনে বৌদ্ধযুগেও শূদ্রের অবস্থার বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন না থাকলেও বা নিম্নবর্ণের সঙ্গে উচ্চতর বর্ণের বৈবাহিক সম্পর্ক, আহারাদি ইত্যাদি সম্পর্কের উপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকলেও বৌদ্ধযুগে প্রথম শূদ্ররা পেয়েছিল শিক্ষার অধিকার। বেদ-মন্ত্রোচ্চারণে বা শিক্ষা গ্রহনে বঞ্চিত শূদ্রের শিক্ষা- অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৌদ্ধযুগেই। জাত বিচার না থাকায় যে কোনো বর্নের মানুষই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারত। বৌদ্ধ ধর্মে আশ্রয় নিয়ে শূদ্ররাও শিক্ষার সম্পূর্ণ অধিকারী বা যোগ্যতা অনুযায়ী আচার্য ও উপাধ্যায় পদের অধিকারী হতে পেরেছিল। সেদিক থেকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, সর্বজনীন ও শূদ্রশিক্ষার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেরই স্থান ছিল সারি পুত্ত ও মৌদগলায়নের ন্যায় ব্রাহ্মণ; আনন্দ, রাহুল ও অনিরুদ্ধের ন্যায় ক্ষত্রিয়; যশ ও অনাথ পিন্ডদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী এবং উপালির ন্যায় শূদ্র সকলেই সংঘে যোগদান করার অধিকার লাভ করেছিল।[১৫] মূলত এই কারণেই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তুলনামূলক ভাবে নমনীয় মৈত্র ও প্রেমের পূজারী বৌদ্ধধর্মে প্রায় সমগ্র ভারত আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথম দিকে বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষা পরিচালিত হলেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধসংঘ গুলির প্রচেষ্টায় জনগণের মধ্যে সাধারণ জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। ভারতে গণশিক্ষার ব্যবস্থা বৌদ্ধদেরই অবদান।[১৬] সংঘে যোগদানের পর রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেককেই একই বস্ত্র ও ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করতে হত। বুদ্ধ জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করে আধ্যাত্মিক সম্পদের সর্বজনীন অধিকার সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বৌদ্ধশিক্ষাব্যবস্থায় শূদ্রদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদ ব্যবস্থা দূরীভূত করে, সবাইকে শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার দান করে, প্রতিষ্ঠানমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে, শিক্ষাকে সর্বজনীন করে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে যে স্থায়ী অবদান রেখে গেছে তার তুলনা নেই।[১৭]

বিশ্বকবি যথার্থই বলেছেন- "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন ইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থণা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন"।[১৮]

মহাকাব্যের যুগে শূদ্রদের সমাজজীবনের মানের বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। সমাজজীবনে বর্ণভেদের উদাহরণ এই সময়েও ভীষণ রকম স্পষ্ট। ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

"চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ"।

মহাভারতে চতুর্বর্ণের বিভাজন ছিল; কিন্তু বিষয়টির প্রতি ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গী -

"ক্রিয়াকর্ম বিভেদেন চাতুবর্ণ্যং প্রতিষ্ঠতম্"।[১৯]

অর্থাৎ সমাজে চারটি বর্ণের বিভাজন ঘটেছে মানুষের গুণ এবং কর্মের উপর ভিত্তি করে।

মহাভারতের শান্তি পর্বেও আছে যে, কর্মানুসারে বর্ণ নির্ধারিত হয়। তবে বনপর্বে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের উচ্চ আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে তেমনি শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শূদ্রের বৃত্তি হল উচ্চতর তিন দ্বিজবর্ণের সেবা করা। যা প্রকৃত অর্থে মনুর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও এক সুর লক্ষ্য করা যায়। ফলতত সমাজজীবনে শূদ্ররা যে এখানেও অবহেলিত হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে বেদে শূদ্রদের অধিকার না থাকলেও পুরাণে তাদের অধিকার ছিল। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র মহাত্মা বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভজাত ছিলেন।[২০] সেযুগে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বিদ্যাচর্চার রকমের বিভিন্নতা ছিল। জীবনের লক্ষ্যভেদে শিক্ষাও ভিন্নরূপে আবির্ভূত হত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি বৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ছিল। তাই মহাকাব্যের শিক্ষাকে 'বৃত্তিশিক্ষা' বলাই সঙ্গত। তিন বর্ণের শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক।[২১] তবে বিদ্যাচর্চা সকলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শূদ্রদের উপনয়ন-সংস্কার না থাকলেও বারো তেরো বছর বয়সে তাদের বিদ্যাভ্যাস শুরু হত (আদি ৮১/১৪)।[২২]

রামায়নেও আমরা এরূপ উদাহরণ দেখতে পাই-কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে শম্বুক বৃত্তান্তে –

"কোন্ জাতি, তপ কর কোন্ প্রয়োজন,
তপস্বী বলেন, আমি হই শূদ্রজাতি
শম্বুক আমার নাম শুন মহামতি "।[২৩]

অকালে শূদ্রের তপস্যায় দ্বিজপুত্র মরেছে, এই ভীষণ মিথ্যা অন্যায়ের পক্ষে থেকেছেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রজাবৎসল রাজা স্বয়ং দশরথ নন্দন রামচন্দ্রও।

"তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রামতুন্ড।
খড়্গ হস্তে কাটিলেন তপস্বীর মুন্ড"।।[২৪]

হায়! কি নির্মম পরিণতি শূদ্রের শিক্ষাকাঙ্খার! এভাবেই যুগে যুগে শূদ্রের শিক্ষার বিচার পদদলিত হয়েছে উচ্চবর্ণের কাছে।

"ব্রহ্মা বলিলেন, রাম, কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হয়ে তপ করে, পাই বড় লাজ"।।[২৫]

উচ্চবর্ণের নিন্দনীয় ঘৃন্য শূদ্র দমনের প্রক্রিয়াকে এইভাবে উৎসাহ বা প্রশংসাদানও আমরা দেখতে পাই মহাকাব্যের যুগে। এইভাবে বর্ণভেদের প্রত্যক্ষ শিকার বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগ থেকে শুরু করে মহাকাব্য যুগ এমনকি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাও।

সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় দলিতের স্থান একেবারেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে ভরা অসম সমাজজীবনেরই হতাশাগ্রস্ত পূর্ণ প্রতিচ্ছবিসম। কর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট বর্ণপ্রথার কারণে বৈদিক যুগে শিক্ষায় শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত না হলেও কিছু ব্যতিক্রম ছিল , ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪ প্রপাঠক, ৪ অধ্যায়ে বর্ণিত ভর্তৃহীনা দাসী জাবলার পুত্র সত্যকাম ঋষি গৌতমের কাছে শিক্ষালাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঋষি তার কাছে গোত্র- পরিচয় জানতে চান একথা সঠিক, কিন্তু সত্যকামের সততা- সত্যতার পরিচয় পেয়ে তিনি শূদ্রপূত্র সত্যকামকে শিষ্য বলে স্বীকারও করেছিলেন। কবিগুরু "ব্রাহ্মণ" কবিতায় উল্লেখ করেছেন -

"... অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত"।[২৬]

এখানেই স্পষ্ট হয়েছে শূদ্রের যোগ্যতা, শিক্ষা গ্রহণের গভীর ব্যাকুলতা। বেদজ্ঞ সত্যকাম বা মহাকাব্যের দাসিপুত্র বিদুর – প্রমুখরা বর্ণ প্রথার এই কঠোর নিকষতার মাঝে চির জ্বাজ্জ্বল্যমান ব্যাতিক্রম।

প্রাচীন যুগে একমাত্র বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় উদারতার কারনে শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বজনীনতা ও সাম্য। বৌদ্ধ শিক্ষায় শূদ্ররা পেয়েছিল শিক্ষায় সমান অধিকারের স্বাদ।প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশীলায় শুধুমাত্র তিন উচ্চবর্ণের ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্র বিখ্যাত নালন্দায় কোনো বর্ণভেদ- জাতিভেদ ছিল না। যে কোনো বর্ণের বা ধর্মের শিক্ষার্থীর কাছে প্রবেশের একমাত্র মাপকাঠি ছিল মেধা। মূলত এই সময়েই শূদ্রদের শিক্ষা ব্রাহ্মণদের সাথে সমান্তরালেই পরিচালিত হয়েছিল। বিদেশী পর্যটক ফা-হিয়েন বা হিউয়েন সাঙের বিবরনী থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগের মধ্যপর্বে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি বিদ্যাচর্চা করতেন। উভয় শিক্ষা ও মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[২৭] অর্থাৎ যোগ্য শূদ্ররা এই সময়ে ব্রাহ্মণের পাশাপাশি বিদ্যার্জনে লিপ্ত ছিল বলেই ধরা যেতে পারে। বর্তমান শিক্ষার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বানের পশ্চাদেও রয়েছে বৌদ্ধশিক্ষার মৌলিকত্ব। যেমন- ভারতের জনশিক্ষা, শিক্ষাকেন্দ্র ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা বা সর্ব শিক্ষা মিশনের মূলভিত্তি স্লোগান 'Education For All'- এগুলির সূত্রপাত ঘটে মূলত বৌদ্ধ শিক্ষাভাবনাতেই।

বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার সর্বজনীন – বিশ্বজনীন সাফল্যের প্রতি কবিগুরুর শ্রদ্ধার্ঘ –

“ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি
সেই নাম আর বার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান কর তুমি।
বোধিদ্রুম তলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ আবরণ ”।[২৮]

মহাকাব্যের যুগে পুরাণ পাঠে শূদ্রের অধিকার সেযুগের শিক্ষাভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মূলত মহাকাব্যের যুগে খানিকটা বাস্তব ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাভাবনায় বর্ণানুসারেই পাঠক্রম রচিত হয়েছিল। এসবই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় শূদ্রের প্রতি অবমাননার বঞ্চনা দিক। তবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ গভীরভাবে বিশ্লেষন করলে অনেক আশাবঞ্জক সদর্থক উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়।

শুক্রনীতিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, জাতি অর্থাৎ জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নির্দিষ্ট হয় না, গুণকর্ম দ্বারাই এদের প্রভেদ নির্ধারিত হয় -

“ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্মভিঃ”।।[২৯]

ফলে চরিত্রবান ও গুণসম্পন্ন শূদ্রের ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হওয়ার সম্ভবনাও সে যুগে ছিল। একথা মহাভারতও স্বীকার করেছে

“শূদ্রোহপি শীলসম্পন্নো গুণবান ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোহপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যন্তরং ভবেৎ”।।[৩০]

অর্থাৎ শূদ্রের যে জাগরণ সম্ভব তার ঈঙ্গিত প্রাচীন কালেই পাওয়া গিয়েছিল। নারদ মুনির ভবিষৎবাণী- কলি যুগ শূদ্রের জাগরণের যুগ –

“ মুনি বলে, রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার।।
ত্রেতাযুগে তপস্যা ক্ষত্রিয়-অধিকার।
দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার।।
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি।।”[৩১]

সে-দিক থেকে দেখলে আধুনিক যুগেই শূদ্রের অভিশাপ মোচন হবে তপস্যা, শিক্ষা সাধনার মাধ্যমে। স্বামীজীর কথায়- “Education, Education, education alone! Through education comes faith in one’s own self, and through faith in one’s ownself inherent Brahman is waking up in them, while the Brahman in us is gradually becoming dormant.”[৩২] আধুনিক ভারতেও একদিকে শূদ্র-দমন এবং অপরদিকে শূদ্র জাগরণের আন্দোলনের ধারা অব্যাহত। সমসাময়িক কালেও শূদ্রের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়, যা সমগ্র ভারতের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় কিন্তু সর্বাপেক্ষা আদিম প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিবাদে একসময় বলেছিলেন- “ পুরোহিত তন্ত্র ভারতবিধ্বংসী বিষ। লাথি মেরে পুরোহিতদের দূর করে দাও। কারণ তারা সর্বদা প্রগতির বিরোধী ”।(Caste Culture and Socialism – Swami Vivekanada)।[৩৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু রচনায় জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিরোধী চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’ জাতপাত বিরোধী আন্দোলনের জীবন্ত দলিল।

সমস্তরকম সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে উঠে শূদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগে যুগে বহু প্রাণ এই পূণ্যধরাধামে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। আধুনিক ভারতের দলিত আন্দোলনের প্রতীক মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং দলিত ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এক অন্তহীন মহাজীবন বাবা সাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর প্রমুখরা বহু সরাসরি আন্দোলনের মাধ্যমে

নিম্মবর্ণীয়দের সমানাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ফলস্বরূপ 25.12.1927 – Red Letter Day - দিনটি শূদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা মনুবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার দিন যেদিন প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রক্ত শোষক ইশ্‌তেহার 'মনুসংহিতা' নিজহস্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করেন ভারতরত্ন ডঃ বি.আর. আম্বেদকর।[৩৪] ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সাল থেকে শুদ্রদের সমান অধিকারকে সাংবিধানিক মর্যাদা দান করেছে। ১৯৮০-র মন্ডল কমিশনের রিপোর্টে শূদ্ররা শিক্ষায় অগ্রগতির হাতিয়ার স্বরূপ লাভ করেছে শিক্ষায় সংরক্ষণ। ২০০৯-এর শিক্ষা অধিকার আইনে (RTE-2009) শিক্ষাধিকার সূচিত হয়েছে জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের জন্য। এসবই শূদ্রের শিক্ষাজীবনে আশির্বাদ স্বরূপ। স্বামীজী শূদ্রের সামাজিক জীবনে উত্তরণের পথ বলেছেন – "উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে"।[৩৫] যা সম্ভব একমাত্র যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে। তবে একথাও ঠিক এই শুভ আশীর্বাদ সমগ্র ভারতের সকল শূদ্রের জীবনে সফলভাবে বর্ষিত হয়নি। আজও শুধুমাত্র দলিত হওয়ার অপরাধে আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে উচ্চমেধার প্রতিভা রোহিত ভেমুলাকে। এ অগৌরব সমগ্র ভারতজাতির। তাইতো রোহিতের নির্মম পরিণামের প্রতিবাদে কলকাতার যাদবপুরে আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের সুর – দলিতের সুর- গণতন্ত্রের সুর- বিশ্ব মানবতার সুর –

" সারা গায়ে আগুন মেখে
ডানা এই ছড়িয়ে দিলাম
এসো তবে আমায় থামাতে
মনু বুকে পা রাখলাম
এত বোঝা এত জ্বালাতন, পৃথিবীও সইতে পারে না,
দলিত বলছো আমাকে, ধ্বংসের দায় নেবো না।
আগুনের জাত, নেই কোনো
আমি তাই জাতহীন আজ
নক্ষত্র ধুলোকনা আমি, পরে আছি যুদ্ধের সাজ "........[৩৬]

জাতিভেদ, বর্ণভেদের এই সংকীর্ণতা ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল সম্পদে সমৃদ্ধ সভ্যতার কাছে অভিশাপ স্বরূপ, ভারতীয় সমাজজীবনে গভীর ক্ষতের ন্যায়। বিরোধী রক্তক্ষয়ী আন্দোলন এ সমস্যা সমাধানের কাঙ্খিত পথ নয়। প্রয়োজন বিশ্বমানবতাবোধ, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও মননের ব্যাপকতা।

বিবেকানন্দের মতো আমরাও আশাবাদী –

.... "এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, ...
শূদ্র ধর্ম-কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে"[৩৭]

তথ্যসূত্র :

১। সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদনা): এক অন্তহীন মহাজীবন, বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, পৌন্ড্র মহাসংঘ, ২০১৬, পৃঃ ২৫
২। ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ : শিক্ষায় একীভবন, ক্লাসিক বুকস্‌, ২০১৫, পৃঃ ১৩৬
৩। তদেব : পৃঃ ১৪৯
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ১৪০৯, পৃঃ ২৩৪
৫। সুকুমারী ভট্টাচার্য : ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, ২০০১, পৃঃ ১৮
৬। ডঃ শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় : বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩, পৃঃ ৪৭-৪৮
৭। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০/৯০/১২ (Ref . উদ্বোধন প্রত্রিকা, ISSN 0971-4316- ১১৫/১৪১৯/তৃতীয় সংখ্যা পৃঃ ১৭১)
৮। অনাদিকুমার মহাপাত্র : ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, সুহৃদ পাবলিকেশন, ২০০২, পৃঃ ১৭
৯। সুকুমারী ভট্টাচার্য : ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, ২০০১, পৃঃ ২১৯

১০। অধ্যাপক ভক্তি ভূষণ ভক্তা : ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ আ ক খ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃঃ ১৬
১১। ডঃ সুবিমল মিশ্র : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, রীতা বুক এজেন্সী, ২০১৩-১৪, পৃঃ ২৬
১২। রণজিৎ ঘোষ : আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ, সোমা বুক এজেন্সী , ২০০৬-২০০৮, পৃঃ ২০
১৩। মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৯, পৃঃ ১১৩১
১৪। তদেব, পৃঃ ৫৪
১৫। অধ্যাপক ভক্তি ভূষণ ভক্তা : ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ আ ক খ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃঃ ৩০
১৬। তদেব, পৃঃ ২৯
১৭। ডঃ সুবিমল মিশ্র : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, রীতা বুক এজেন্সী, ২০১৩-১৪, পৃঃ ১০৬-১০৭
১৮। জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ২০১৫, পৃঃ ৪১
১৯। ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ : শিক্ষায় একীভবন, ক্লাসিক বুকস্, ২০১৫, পৃঃ ১৮৭
২০। অধ্যাপক ভক্তি ভূষণ ভক্তা : ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ আ ক খ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃঃ ১৯
২১। তদেব, পৃঃ ৫৫
২২। ডঃ সুবিমল মিশ্র : ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, রীতা বুক এজেন্সী, ২০১৩-১৪, পৃঃ ৪৩
২৩, ২৪ ও ২৫। কৃত্তিবাস বিরচিত সপ্তকান্ড রামায়ণ : রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৩, পৃঃ ৫০৫
২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ১৪০৯, পৃঃ ২৩৬
২৭। সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদনা): এক অন্তহীন মহাজীবন, পৌন্ড্র মহাসংঘ , ২০১৬, পৃঃ ২৫
২৮। তদেব, পৃঃ ৩৫
২৯। ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ : শিক্ষায় একীভবন, ক্লাসিক বুকস্, ২০১৫, পৃঃ ১৯০
৩০। তদেব : পৃঃ ১৯০
৩১। কৃত্তিবাস বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ : বিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৩ পৃঃ ৫০৪
৩২। ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ : শিক্ষায় একীভবন, ক্লাসিক বুকস্, ২০১৫, পৃঃ ১৪৮
৩৩। সনৎ কুমার নস্কর (সম্পাদনা): এক অন্তহীন মহাজীবন, পৌন্ড্র মহাসংঘ , ২০১৬, পৃঃ ১৪৩
৩৪। তদেব, পৃঃ ৬৯
৩৫। ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ : শিক্ষায় একীভবন, ক্লাসিক বুকস্, ২০১৫, পৃঃ ১৫১
৩৬। এ প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞ গানটির রচয়িতা ও সুরকার - নন্দিনী মল্লিকের কাছে, যিনি রোহিত ভেমুলার আত্মাহুতির প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে প্রতিবাদ স্বরূপ গানটি রচনা করেছিলেন এবং গানটি ধ্বনিত হয়েছিল আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উদাত্ত কণ্ঠে।
৩৭। ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ : শিক্ষায় একীভবন, ক্লাসিক বুকস্, ২০১৫, পৃঃ ১৪৭

গ্রন্থঋণ

১। নন্দ বিষ্ণুপদ। শিক্ষায় একীভবন। ক্লাসিক বুকস্। ২০১৫
২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ । সঞ্চয়িতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ। ১৪০৯
৩। ভট্টাচার্য সুকুমারী । ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০০১
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী শান্তি । বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা । সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার । ২০০৩
৫। ঋগ্বেদ সংহিতা । ১০/৯০/১২ (Ref . উদ্বোধন প্রত্রিকা, ISSN 0971-4316- ১১৫/১৪১৯/তৃতীয় সংখ্যা)
৬। বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রসাদ । ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা । সেন্ট্রাল লাইব্রেরী। ২০১৫
৭। কৃত্তিবাস বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ । বিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। ১৯৮৩
৮। নস্কর সনৎ কুমার (সম্পাদনা) । এক অন্তহীন মহাজীবন । পৌন্ড্র মহাসংঘ । ২০১৬
৯। মিশ্রসুবিমল । ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস । রীতা বুক এজেন্সী । ২০১৩-১৪
১০। ভক্তা ভক্তি ভূষণ । ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা । অ আ ক খ প্রকাশনী। ২০০৯
১১। মহাপাত্র অনাদিকুমার । ভারতীয় সমাজব্যবস্থা। সুহৃদ পাবলিকেশন । ২০০২

১২। বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু । মনুসংহিতা । সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার । ১৪১৯
১৩। ঘোষ রণজিৎ । আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ । সোমা বুক এজেন্সী । ২০০৬-২০০৮
১৪। চক্রবর্তী অনিরুদ্ধ ও ইসলাম নিজাইরুল। শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ। ক্লাসিক বুকস। ২০১৪
১৫। দে ভক্তি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য। নব চলন্তিকা। ২০০২
১৬। চট্টোপাধ্যায় জয়শ্রী। মহাকবিনাশ্বঘোষেন রচিতম্ বুদ্ধচরিতম্ সানুবাদ সম্পাদনা। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার। ২০০৮
১৭। দে হরিপদ । নির্বাচিত প্রবন্ধ । পারুল । ২০১৬